বেলা-অবেলার কথা

আগাছা এবং আগাছানাশক : সমস্যা এবং সম্ভাবনা

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আগাছা বলে কিছু নেই, আয়ুর্বেদেও নেই। এমনকি জীববৈচিত্র্য নিয়ে যদি কিছু বলতে হয় সেখানেও আগাছার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। কিন্তু কৃষি বিজ্ঞানে আছে। আগাছা কাকে বলে, কত প্রকার থেকে শুরু করে কিভাবে এরা আমাদের ক্ষতি করছে এবং সেগুলো দমন করার জন্য মলিক্যুলার বায়োলজি থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সবই আছে। আগাছার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব পড়ানো হয়। পাশাপাশি এই আগাছা নিয়ে যারা গবেষণা করেন বা কথাবার্তা বলেন তাদের স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সংগঠনও আছে। তাই বিষয়টি আগাছা হলেও একেবারে উপড়ে ফেলে দেয়ার বিষয় নয়।

আগাছা এক সময় আমাদের জন্য তেমন উদ্বেগের বিষয় ছিল না। ফসল থাকলে আগাছা থাকবে, বিষয়টি ছিল এমনই। গ্রামবাংলার মানুষ এখনও আগাছাকে আগাছা বলে না। বলে ঘাস। আর ঘাস হলো গরু-মোষের খাবার। জমি নিড়িয়ে ঘাস পরিষ্কার করা এবং তা বাড়ি এনে ঝেড়ে-মুছে বা প্রয়োজনে ধুয়ে গবাদি পশুকে খাওয়ানো আমাদের নৈমিত্তিক কৃষি কাজের একটি অংশ ছিল এক সময়। এখন যুগের পরিবর্তনে সেখানেও পরিবর্তন এসেছে। গ্রামে ঘাস নিড়িয়ে পরিষ্কার করার লোকের অভাব। কাজের ঝামেলাও বেড়ে গেছে। অতএব কখনও নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে ঘাস পরিষ্কারের কথা আসছে। কখনও বা কাজটিকে আরও সহজ করার জন্য আগাছানাশক ছিটিয়ে ঘাস মেরে পরিষ্কার করার কথা বলা হচ্ছে। যন্ত্র দিয়ে ঘাস পরিষ্কার কিছুটা সময়সাপেক্ষ। পদ্ধতিটি পরিবেশবান্ধব হলেও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও জনপ্রিয় হচ্ছে না। কিন্তু আগাছানাশক ছিটিয়ে ঘাস পরিষ্কার বেশ সহজ এবং চাষিকে এজন্য বেশি সময় রোদের মধ্যে সময় কাটাতে হয় না। তাই এখন আমাদের চাষিরা এদিকেই বেশ ঝুঁকে পড়ছেন বলে মনে হচ্ছে। ১৯৮৬ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী আগাছানাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০৮ টন। এবং তার বেশিরভাগই ব্যবহার করা হতো চা বাগান বা অনুরূপ কোনো সীমিত পরিসরে। এখন এর পরিমাণ বেড়েছে কয়েকশ' গুণ এবং ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষির সব শাখায়, সব জায়গায়। তবে লাখ টাকার প্রশ্ন হলো আগাছা ব্যবহার কি নিরাপদ? কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, নিয়ম-কানুন মেনে আগাছানাশক ব্যবহার করতে হবে। এখানেই বোধ হয় সমস্যা। এম. ওলোফসডটার বলে একজন বিখ্যাত আগাছা বিশেষজ্ঞের কথা প্রণিধানযোগ্য। ভদ্রমহিলা এক সময় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে কাজ করতেন। তিনি বলেছেন, "Subsequent dispersion of herbicide compounds and their degradation products in rice fields and adjacent areas with strong ecological values still threatens the integrity of ecosystems, thus resulting in serious global concern". এজন্যই বোধ হয় কেউ কেউ বলছেন, Herbicides are "two edged sword" অর্থাৎ আসতেও কাটে যেতেও কাটে।

মূলত আগাছা মারার জন্য আগাছানাশকের ব্যবহার হলেও আমাদের অগোচরে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। নিবিড় আবাদি ধানের প্রতিবেশে হেক্টর প্রতি ৭০০-১০০০ প্রজাতির প্রাণবৈচিত্র্যে থাকতে পারে বলে প্রকাশ। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থায় কর্মরত বিজ্ঞানী কেনমুর ১৯৯১ সালে তার এক লেখায় কথাগুলো বলেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে (Impact of Herbicides on Non-Terget Organism in Sustainable Irrigated Rice Production System : State knowledge and Future Prospects by Victor et al., www.intechopen.com) বলা হচ্ছে যে রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশক মূলত আগাছানাশকের বর্ধিত ব্যবহার এ জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির কারণ। এই প্রবন্ধে নন-ফটোসিনথেটিক অণুজীব, ফটোসিনথেটিক অণুশৈবাল, নাইট্রোজেন-ফিক্সিং সায়ানোব্যাক্টেরিয়া, অমেরুদণ্ডী প্রাণীকূল, মেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন মাছ এবং উভচর প্রাণীর ওপর আগাছানাশকের খুপ্রভাব নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। স্পেন এবং পর্তুগালের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের প্রণীত এই প্রতিবেদন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তবে আগাছানাশক যে মাটির আণুজৈবিক পরিবেশে তেমন প্রভাব রাখতে সক্ষম নয় এমন গবেষণা বা প্রবন্ধেরও অভাব নেই। অতএব আগাছানাশক হলেই চলবে না। তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন ভালো আগাছানাশককে অবশ্যই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত হতে হবে। অথবা যতটা কম হয় ততটাই ভালো। তাদের মতে ভালো আগাছানাশক মাটির অণুজীবের প্রভাবে ভেঙে গিয়ে নির্দোষ অবশেষ পদার্থে পরিণত হয়। তাই তার কোনো আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা থাকে না।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ভালো আগাছানাশকগুলোই বাজারজাত করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দাবি করছে। আমাদের দেশে ধানের জমিতে ২৯ ধরনের রাসায়নিক গ্রুপের আগাছানাশক ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো, প্রিটাইলাক্লোর, পাইরাজোসালফিউরান ইথাইল, বুটাক্লোর, অক্সাডায়াজোন, গ্লাইফসফেট, প্যারাকুয়েট, কারফেনট্রাজোন ইথাইল, এমসিপিএ, ইথোক্সিসালফিউরান, ট্রাইসালফিউরান + ডিকাম্বা, ২, ৪ ডাই অ্যামাইন, ২, ৪, ডি, পেনডামিথাইলিন, মেফনাসেট + বেনসালফিউরান মিথাইল, বেনসালফিউরান মিথাইল + এসিটাক্লোর, বুটাক্লোর + প্রোপানিল, পাইরাজোসালফিউরান ০.৬% + প্রিটাইলাক্লোর ৩৪.৬%, বিসপাইরিব্যাক সোডিয়াম অক্সিফ্লুরফেন, বেনসালফিউরান মিথাইল + কুইনক্লোর, এসিটাক্লোর, সায়ালোপ বিউটাইল, ফেনোক্সপ্রো-পি-ইথাইল, অর্থসালফোমিউরান, পেনোক্সোলাম, এনিলফস, সিনমিথাইল এবং সিনোসালফিউরান। এর মধ্যে প্রিটাইলাক্লোর গ্রুপের আগাছানাশকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৫০টি। পাইরোজোসালফিউরান ইথাইল এবং বুটাক্লোর ৩২টি করে। গ্লাইফসফেট গ্রুপের সংখ্যা ২০টি। বাকিগুলো ১-১০টি পর্যন্ত।

ভালো আগাছানাশকগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিধিমাফিক প্রয়োগ করলে ফসলের ধানের কোনো ক্ষতি করবে না। ক্ষতি করবে শুধু টার্গেটেড এক বা একাধিক আগাছাকে। এভাবে একই জাতীয় আগাছা ব্যবহার করতে থাকলে অনেক সময় গতানুগতিক আগাছাগুলো বিলুপ্ত হয়ে নতুন ধরনের আগাছার উপদ্রব শুরু হয়। আবার এমনও হতে পারে যে টার্গেটেড আগাছাগুলো বহুল ব্যবহৃত আগাছানাশকের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রতিরোধী হয়ে যায়। অর্থাৎ এতদিনের প্রচলিত আগাছানাশক আর কাজ করে না। ফলে চাষিরা অতিরিক্ত আগাছানাশক প্রয়োগ শুরু করে দেন এবং পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। আগাছানাশকের অযাচিত ব্যবহার অনেক সময় ফসলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। চাষি প্রশিক্ষিত না হলে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতে পারে। আমাদের দেশে এমন ঘটনা যে ঘটছে না এমন নয়। এসব ক্ষেত্রে মলিক্যুলার বায়োলজিস্টদের সহায়তায় কিছু কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করছেন। তারা নির্দিষ্ট আগাছানাশক প্রতিরোধী জিন শনাক্ত করে তা ফসলের মধ্যে সংযোজন করছেন। ফলে ব্যবহৃত কোনো ফসলের জাত নির্দিষ্ট কোনো আগাছানাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। বিষয়টি বিতর্কের বাইরে নয়। কারণ এক্ষেত্রে চাষি যদি কিছুটা বেশি মাত্রায়ও আগাছানাশক প্রয়োগ করে তাহলে তার ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না, অথচ প্রতিরোধে অক্ষম আগাছাসহ কিছু একই জাতীয় প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি বাড়তেই থাকবে। যা হোক এ ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করার নেই। কারণ আমাদের দেশে এখনও এ পরিস্থিতি আসেনি। তবে এ বিষয়ে আমাদের গবেষণা করা উচিত।

প্রচলিত আগাছানাশকসহ সব বালাই নাশকই রাসায়নিক পদার্থ থেকে সংশ্লেষিত। এগুলোর সরাসরি ব্যবহার মানুষ ও পশু-পাখির জন্য ক্ষতিকর। ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশের জন্যও যদি মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়, নিয়মমাফিক ব্যবহার না করা হয়। বা হরহামেশাই ব্যবহার করা হয়। কারণ পরিবেশেরও তো একটা সহ্য ক্ষমতা আছে।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, আগাছানাশক ব্যবহার না করে যতটা পারা যায়। শুদ্ধ চর্চার কৃষিও বোধ হয় সেই কথা বলে। কিন্তু আমরা কি তাই পারি! কৃষি তো এখন শুধু খোরপোষের জন্য নয়, লাভ-লোকসানের ব্যাপারও এখানে আছে। আর কঠিন সত্যিটা হলো– আমাদের অধিকাংশ সময় সহজ পথটি বেছে নিতে হয়। ধান গবেষণায় কাজ করলেও গ্রামের বাড়িতে নিজের সামান্য কিছু জমিজমা আমাকে দেখতে হয়। শ্রমিক আক্রা হওয়ায় ধানের ফলন বাঁচাতে অবশ্যই আগাছানাশকের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সেটা কতটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করাতে পারি জানি না। আমারই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমার প্রতিবেশীদের অবস্থা কি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আগাছানাশকের ভালো-মন্দ নিয়ে কথা বলা বেশ অসুবিধাজনক। তবে নিজে কৃষিবিজ্ঞানীদের একজন হওয়ায় শুধু বলতে পারি, বিজ্ঞানকে দোষারোপ করে লাভ নেই। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগকে দোষ দিতে হবে। জৈব কৃষি নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরিহার করা যাবে না। সেই সময় অনেকটা চলে গেছে। তবে যতটা কম ব্যবহার করা যায় সে চেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে। আমাদের চেষ্টা থাকবে পরিবেশনির্ভর কৃষি রসায়ন খুঁজে বের করা, প্রচলিত আগাছানাশকের পরিবেশনির্ভর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এ ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরি করা। অবশ্য কৃষিতে আগাছানাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনার আরেকটি উপায় হলো অ্যালেলোপ্যাথি। অর্থাৎ ফসল নিজেই তার শরীরের গন্ধ দিয়ে আগাছাকে বশে রাখবে। ধানের বেলায় বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। তবে সময় লাগবে। এ বিষয়ে পরে লিখব আশা করছি।